ভাষাতত্ত্ব

প্রঃ বাংলা ভাষার ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেকটি যুগের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

প্রঃ বিভিন্ন যুগে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা কর।

উঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত থেকে দীর্ঘদিন ব্যাপী অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাকৃত অপভ্রংশ অবহঠটের ক্ষেত্র অতিক্রম করে সাম্প্রতিক কালের বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি শাখা প্রাচীন, মধ্য ও নব্য। এই নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাই এখনো বাংলা ভাষা রূপে জীবন্ত আছে। বাংলা ভাষার জন্মক্ষণ সম্পর্কে বলা যায় আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ অবহঠট থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। তাই বলতে হয় আনুমানিক ৯০০খ্রীঃ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার যে গতি প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয় তাকে মূলতঃ তিনটি যুগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা ১। প্রাচীন বাংলা (OB) ২। মধ্য বাংলা (MB) ৩। আধুনিক বাংলা (NB)।

১। **প্রাচীন বাংলা** (Old Bengali) ঃ আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এর সময় সীমা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শণ রূপে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত 'চর্যাগীতি', সর্বানন্দের অমরকোষ, বৌদ্ধ কবি ধর্মদাস রচিত বিমুগ্ধ মুখমন্ডল, সেক শুভদিয়া ইত্যাদি। এযুগের বাংলার ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল ঃ

ক) ক্ষতিপূরণ যুগ্ম ব্যঞ্জন লোপ = ধর্ম > ধর্ম্ম > ধাম

খ) পদান্তিক স্বরধ্বনির স্থিতি = ভনতি > ভনই

গ) য় শ্রুতি ও বশ্রুতি = নিকটে > নিয়ড্ডী

ঘ) বিভক্তি যোগে সম্বন্ধপদ = এর/অর/র (রুখের তেন্তড়ি)

ঙ) বিভক্তিত যোগে গৌণকর্ম = ক/কে/রে (ঠাকুরক ঠাকুরকে)

চ) বিভক্তি যোগে আধিকরণ = ই/এ/ইতে (নিয়ড্ডী = নিকটে)

ছ) বিভক্তি যোগে করণ ও সম্প্রদানের পদ = এ (সাঁদে = শব্দের দ্বারা)

জ) বিভক্তি স্থানে কিছু অনুসর্গের ব্যবহার = (তাহোর অন্তরে = তোর তরে)

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার, সঠিকভাবে, প্রাচীন বাংলার সময় সীমা আনুমানিক ৯০০ খ্রীঃ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১২০০ খ্রীঃ থেকে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই সময় সীমার মধ্যে কোন বাংলা ভাষায় রচিত নিদর্শন না পাওয়ায় এই সময়টিকে অনুর্বর পর্ব বা অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

২। **মধ্য বাংলা** (Middle Bengali) ঃ আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৭৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত মধ্য বাংলার সময়-সীমা। হিসাব অনুযায়ী মধ্য পর্বের বিস্তার প্রায় সুদীর্ঘ চারশ বছর, তাই এই দীর্ঘ পর্বটিকে দু'টি উপপর্বে ভাগ করা হয়, যথা—

[i] আদিমধ্য (Early Middle Bengali) ঃ আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৫০০

Scanned with CamScanner

খ্রীঃ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই পর্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল।

ক) আ-কারের পরবর্তী ই/উ ধ্বনির ক্ষীণতা = বড়াই >বড়াই

খ) সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে-রা বিভক্তি = আম্মারা > আমরা

গ) ঈল যোগে অতীত কাল ও ইব যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপ = শুনিলোঁ, করিবোঁ,

ঘ) আছ ধাতু যোগে যৌগিক কালের পদ লই +(আ) ছে > লইছে ইত্যাদি, এছাড়া পয়ার ছন্দের সৃষ্টি।

[ii] অন্তমধ্য বাংলা (Late Middle Bengali) আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অন্তমধ্যবাংলার সময়সীমা। এই পর্বের সাহিত্যিক নিদর্শন বলতে মঙ্গল সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের, অনুবাদ ইত্যাদি। এই সময়ের বাংলা ভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল—

ক) একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী পদান্তিক স্বরধ্বনির লোপপ্রবণতা রাম > আম।

খ) মধ্যস্বরের লোপ ভাবনা > ভাবনা গামোছা > গামছা

গ) আপিনিহিত = কালি > কাইল, করিয়া > কইর‍্যা।

ঘ) বিশেষ্যের কর্তৃকারকের বহুবচনে রা বিভক্তি

নাম ধাতুর ব্যবহার নমস্কার > নস্কারিল। এছাড়া আরবি, ফারসী, শব্দের অনুপ্রবেশ ; বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলির ব্যবহার ইত্যাদি

৩। আধুনিক বাংলা (New Bengali) ঃ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে (আধুনিক কাল পর্যন্ত) বর্তমান কাল পর্যন্ত আধুনিক বাংলার সময়সীমা। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বাঙালীর মুখের বাংলা ভাষা। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ থেকে শুরু করে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকদের সৃষ্ট সাহিত্য। তবে এঁদের সাহিত্যে শুধু মাত্র, বাঙালীর মুখের ভাষা পাওয়া যায় না সাহিত্যের ভাষাও পাওয়া যায়। তাই এখানে দুটি ধারা বর্তমান। একটি কথ্যরীতি যা মুখের ভাষা, চলিত ভাষা নামে পরিচিত, আর একটি সাধুভাষা, যা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যাইহোক, আধুনিক কালের বাঙালীর মুখের ভাষাকে পাঁচটি আঞ্চলিক উপভাষায় বিভক্ত করা হয়, যথা— ক) রাঢ়ী = মধ্য পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা, খ) ঝাড়খন্ডী = দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবঙ্গের অংশত বিহারের উপভাষা, গ) বরেন্দ্রী = উত্তরবঙ্গের উপভাষা, ঘ) বঙ্গালী = পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের উপভাষা, ঙ) কামরূপী/রাজবংশী = উত্তর পূর্ববঙ্গের উপভাষা।

এদের মধ্যে গঙ্গাতীরবর্তী তথা কলকাতার নিকটবর্তী পশ্চিমবাংলার রাঢ়ীভাষার উপর ভিত্তিকরে এখন সর্বজনীন আদর্শ চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali) রূপ গড়ে উঠেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলিত ভাষার গদ্যরীতির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করার মত। এই যুগের চলিত বাংলার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হোল—

ক) অভিশ্রুতি = করিয়া > কইর‍্যা > করে

খ) স্বর সঙ্গতি = দেশী > দিশি।

গ) বহুপদী ক্রিয়া রূপ = গানকরা, জিজ্ঞাসা করা।

ঘ) ইংরাজী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার = চেয়ার টেবিল।

তাছাড়া নতুন নতুন ছন্দরীতি গদ্যছন্দের সৃষ্টি। ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

বাংলা ভাষার যুগবিভাগ

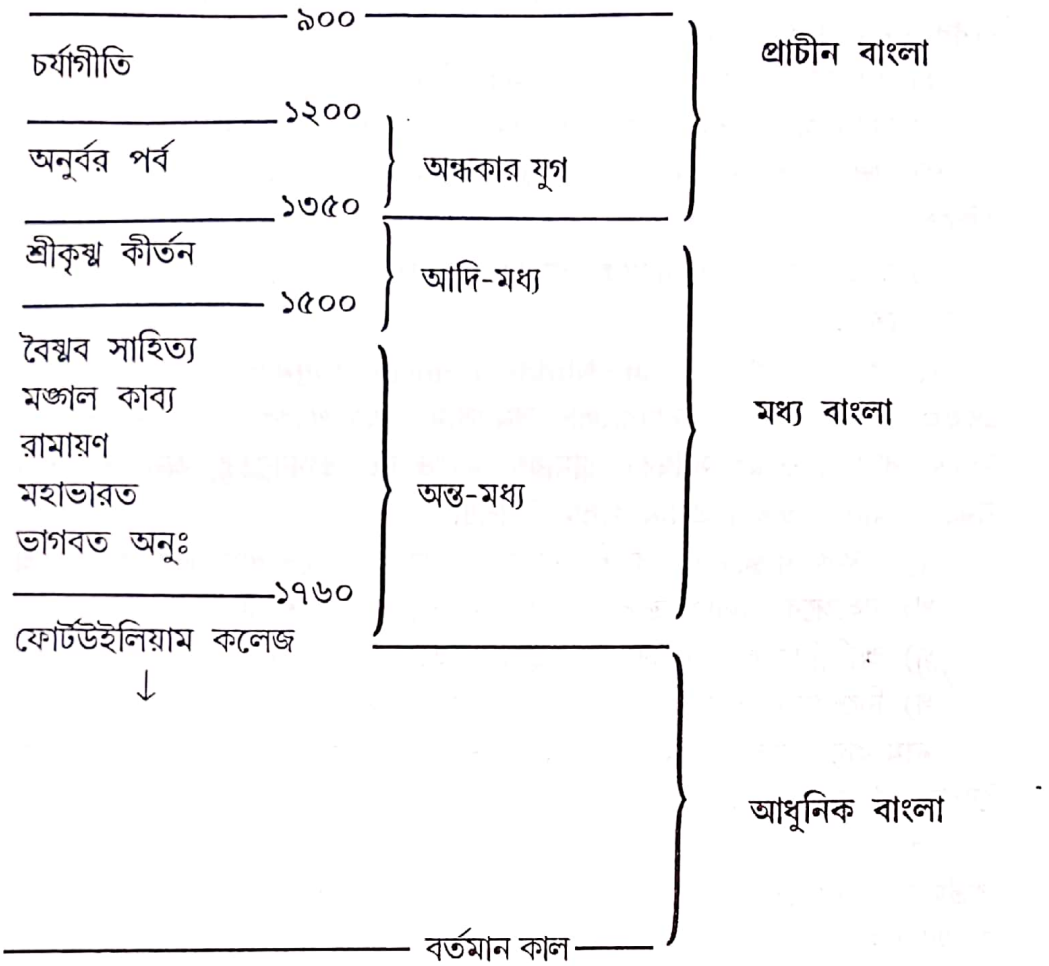

প্রঃ প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন বলতে কি বোঝ ? প্রাচীন বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলির পরিচয় দাও ?

সাধারণত প্রাচীন বাংলার বিস্তৃতিকাল আনুমানিক, ৯৫০—১৩৫০খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়। এই যুগের বাংলা ভাষার প্রধান নিদর্শন হোল বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধনা দর্শন বিষয়ের প্রতীক ধর্মী ভাষায় রচিত চর্যাগীতিকা বা চর্যাপদ। মহামোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রীঃ নেপালের রাজদরবার থেকে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আবিষ্কার করে 'হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' গ্রন্থের অন্তর্গত চর্যাচর্য বিনিশ্চয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেছিলেন। এগুলি ছাড়া প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অন্য যে নিদর্শন গুলির কথা ডঃ সুকুমার সেন উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি নিতান্তই বিক্ষিপ্ত। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল সংস্কৃত গ্রন্থের অমর কোষের সর্বানন্দ লিখিত টীকায় প্রদত্ত চার শর বেশী বাংলা প্রতিশব্দ। এছাড়া বৌদ্ধ কবি ধর্ম দাসের বিদগ্ধ মুখ মন্ডলের উদ্ধৃত চারটি বাংলা কবিতা আর সেক শুভদয়ার উদ্ধৃত কয়েকটি বাংলা গান ও ছড়া। এই সব নিদর্শন খ্রীস্টীয় ৯৫০—১২০০ অব্দের মধ্যে রচিত। ১২০০—১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষায় রচিত কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই এই পর্বকে অনুর্বর পর্ব বা অন্ধকার যুগ বলতে পারি।

Scanned with CamScanner

এই দেড়শ বছরের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আমরা জানতে পারি না। তাই একে প্রাচীন বাংলা বা মধ্য বাংলার মধ্যে ফেলতে হবে তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না, তাই সংশয়াতীত ভাবে বলতে হোলে বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের বিস্তার কাল ৯৫০—১২০০ অব্দ পর্যন্ত বলা যায়।

❑ প্রাচীন বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ❑

১। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ছিল সেগুলি সমীভবনের ফলে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় সম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় এই যুগ্ম ব্যঞ্জনের থেকে একটি ব্যঞ্জন লোপ পেল। এবং এই লোপের ফলে পরবর্তী স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়ে গেল। যেমন—

জন্ম > জম্ম > জাম/কর্ম > কম্ম > কাম

এই প্রক্রিয়াকে ক্ষতি পূরক দীর্ঘ ভবন বলা হয়। কিন্তু এই নিয়মের দীর্ঘভবনও দেখা যায়। যেমন—

ভিক্ষা > ভিছা > মিথ্যা > মিছা

খ) কোন কোন ক্ষেত্রে নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেছে। এই প্রক্রিয়াকে নাসিক্য ভবন বলা হয়। যেমন—শব্দেন > সাঁদে। কিন্তু এই নিয়মের মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন—চন্দ্র > চান্দ/চাঁদ।

গ) দুটি স্বরের মধ্যবর্তী একক অল্প প্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জন মধ্যে ভারতীয় আর্য ভাষায় লোপ পেয়েছিল কিন্তু তাদের সঙ্গে যুক্তি স্বরধ্বনিটি পায়নি। এই স্বরধ্বনিটি লক্ষিত ছিল। একে উদ্বৃত্ত স্বরবলা হয়। যেমন—ভনতি > ভনই।

ঘ) দুটি স্বরের মধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জন প্রাচীন বাংলায় কোন কোন ক্ষেত্রে 'ই' কারে পরিণত হয়েছে। যেমন—মুগ্ধ > মুগহ। কিন্তু এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন—"সুখ দুঃখেতেঁ লিখিত মহিঅই"

ঙ) তালব্য শ্রেণীর 'শ' তে দন্ত্য 'স' এর ব্যবহারে ব্যাপক প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—শ্বশুর > সসুরা (চর্যাপদ)

২। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক) কর্ত্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি হীনতা প্রাচীন বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যেমন—চঞ্চল চীত্য পইঠোকাল, ভনই, কহিন। অনির্দিষ্ট কথায় অবশ্যই এর বিভক্তি হোত। যেমন—"রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাএ"

খ) প্রাচীন বাংলা গৌন কর্মে ও সম্প্রদান কারকে 'ক'/কে/রে বিভক্তি যুক্ত হোল অথবা কখনো কখনো শূন্য বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—"মতি এঁ ঠাকুরক পরিনি বিত্তা"

গ) করণ কারকে বিভক্তি ছিল এঁ। যেমন— "মতি এঁ ঠাকুরক....."

ঘ) অধিকরণে বিভক্তি ছিল ই/এ/হি/তে/ও যেমন—"চঞ্চল চীত্র পইঠোকাল।"

ঙ) এ বিভক্তি কখনো কখনো অপাদান কারকে ব্যবহৃত। যেমন—কামে জাম কি জামে কান? হোত। সম্বন্ধ পদে বিভক্তি ছিল এর/র/ক যেমন—'রুখের তেন্তলি'

Scanned with CamScanner

ছ) কোন কোন কারকে বিভক্তি চিহ্নের বদলে অনুসর্গের ব্যবহার প্রচলিত হয়ে ছিল। যেমন—"তোহোর অন্তরে"

জ) কোন কোন বহু বচনের পদ অস্মাভু > পা, অমহাহি > প্রা, অমহহি > প্রাচীনবাং, আম্হে/অমহে এর নানা রকম বানান ছিল—আম্হে > অম্হে > অম্হে > অম্হে।

ঝ) ক্রিয়ার রূপে বর্তমান কালে বিভক্তি ছিল—

উত্তম পুরুষের সি/হুঁ	যেমন = পুছামি
মধ্যম পুরুষে = সি	যেমন = জাসি
প্রথম পুরুষে = ই	যেমন = ভণই

ঞ) অতীত কালের ক্রিয়ার রূপ গঠন করা হোত ধাতুর সঙ্গে 'ত' প্রত্যয় যোগ করে অথবা ল/ই যোগ করে। যেমন = প্র √বিশ + ক্ত = প্রবিষ্ঠ > পইঠো (চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল)।

ট) ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পুরুষে বিভক্তিছিল ইব, যেমন = √ভ + ইব = ভাইব/ভাববো)

ঠ) অসমাপিকার রূপ গঠন করা হোত নানা ভাবে। তার মধ্যে একটা বহুপ্রচলিত রীতি হোল—ধাতুর সঙ্গে ই অ / ই আ যোগ করা। যেমন = পুছ + ইঅ = পুচ্ছঅ।

ক) কর্তা = ০

খ) গৌণকর্ম/সম্প্রদান = কে

গ) করণ = এঁ

ঘ) অধিকরণ = এ

ঙ) অপাদান = এ

চ) সম্বন্ধ = এর

ছ) বিভক্তির বদলে অনুসর্গ = তোহোর অন্তরে

জ) বহু বচনের পদ = অস্মাভি

ঝ) বর্তমান কালের বিভক্তি = মি/মি/ই

ঞ) অতীত কালে ও প্রত্যয় যোগ = প্র + বিশ + ক্ত = প্রবিষ্ঠ

ট) ভবিষ্যৎ কালে উত্তমে বিভক্তি = ইব + ভি + ইব = ভাইব

ঠ) অসমাপিকা ধাতুর সঙ্গে ই অ যোগ বপিদ + ইস

৩। ছন্দরীতির বৈশিষ্ট্য ঃ

ক) চর্যার কবিতায় বিভিন্ন প্রকার ছন্দ পাওয়া যায়। তার মধ্যে সংস্কৃত পজ্ঝটিকার ছন্দ থেকে আগত ষোল মাত্রা পাদাকুলক (৪/৪/৪/৪) ছন্দই প্রধান। চর্যা থেকে এই ছন্দের উদাহরণ হল—দুলি দুহি/পিটা/ধরণ ন/জাই/রুখের/তেন্তলি/কুম্ভীরে/খাঅ

❑ মধ্যবাংলার সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ❑

সাধারণতঃ মধ্যবাংলার ব্যাপ্তিকাল ধরা হয়—১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ মধ্য যুগের বিস্তৃতি কাল প্রায় চার শত বছর। সেই চার শত বছর ধরে কোন জীবন্ত ভাষা একরূপে অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। এই বিস্তৃত পর্বের মধ্যে বাংলা ভাষারও লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়েছিল। সেই পরিবর্তনের চিহ্ন ধরে এই পর্বকে দুটি উপপর্বে ভাব করা হয়েছে—আদিমধ্য (১৩৫০—১৫০০খ্রীঃ) ও অন্ত্যমধ্য (১৫০০—১৭৬০ খ্রীঃ)।

Scanned with CamScanner

❑ আদিমধ্য বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ❑

আদিমধ্য যুগের একমাত্র প্রমাণিক নিদর্শন বড়ু চন্ডীদাসের শ্রী কৃষ্ণকীর্তন কাব্য, এটি ছাড়া মোটামুটি ভাবে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এবং কয়েকটি মঙ্গাল কাব্যকেও এই পর্বের রচনা বলে ধরা হয়। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই এই পর্বের শেষের দিকের রচনা এবং এগুলির ভাষা পরবর্তী কালে এত বেশী পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল যে এগুলিকে আদিমধ্য বাংলার ভাষার প্রমাণিক নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা যায় না। কাজেই শুধু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপরে নির্ভর করে এই পর্বের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য গুলি নির্ণয় করা যেতে পারে।

১। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক) 'আ' কারের পরস্থিতি 'ই' কার ও 'উ' কার ধ্বনির ক্ষীণতা এই যুগের বাংলার অন্যতম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। এছাড়া, পাশাপাশি অবস্থিত দুই ধ্বনির মধ্যে দ্বিতীয়টি ক্ষীণ উচ্চারিত হতে পারে এবং তার ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুই ধ্বনি মিলিয়ে যৌগিক স্বরের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন—আওঁ (জাওঁ), এউ (দেউ) ইআঁ (পসিআঁ), এ আ (বেআকুলী), ওআ (গোআলিনী) আই (নাইল), আত্র (বাত্র) ইত্যাদি।

খ) নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংযোগে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন—কান্তি > কাঁতি, ঝম্প > ঝাঁপ, তবে এর ব্যতিক্রম আছে। যেমন চন্দ্রাবলী, কুম্ভার, আম্মি ইত্যাদি।

গ) মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ অথবা ক্ষীণতা আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ ই-কার যুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন থেকে হ-কার লোপ পেয়েছে যেমন—হ্ন (ন্হ) > ন এবং ম্ম (ম্হ) > ম। অর্থাৎ কাহ্ন > কানু, আম্মি > আমি। তবে এই পর্বের ভাষায় কানু ও আমি শব্দের পরিবর্তে কহ্ন ও আম্মি অধিক প্রচলিত।

২। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক) কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি-শীতল মনোহর বাঁশি কে না বাএ

খ) আদিমধ্য যুগে কর্মেও বিভক্তিহীনতা তুঁহ এখনই সন্তার দেই জো চাহসি সো লেহি।

গ) গৌণকর্মে ও সম্প্রদানে ক-কে-রে বিভক্তি— কংসকে বুলিয়ে কথ্যা আকাঁসে আঁকিয়া।

ঘ) পঞ্চমী বিভক্তির বদলে হৈতে অনুসর্গের সাহায্যে অবদানের অর্থ প্রকাশ করা হত—গো-ঠে হৈতে আসি আম্মি বুটী গোআলিনী।

ঙ) সম্বন্ধ পদের অর্থ প্রকাশের জন্য ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল র, এর, ক, কের—বারেঁ বারেঁ কাহ্ন সে কাম করে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১। ক্ষতিপূরণ দীর্ঘভবন জন্ম > জন্ম > হাম

২। নাসিক্যভবন = শব্দেন > সাঁদে

৩। উদ্ব ও স্বরধ্বনি = ভনতি > ভনই

৪। একক অল্প প্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন হতে পরিণতি = মগ্ধ > মুগহ

৫। শ > স = শ্বশুর > সসুরা।

Scanned with CamScanner

চ) ধাতুর সঙ্গে ই, ই আঁ, ক ইতে -ইলে যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ রচিত হত, যেমন—

সুন্তিআঁ পেলাইবোঁ কেশ।

ছ) অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি -এ তে মদনবানে পরানে আকুলীল,

জ) উত্তম পুরুষের সর্বনাম ছিল আহ্মে মোঁ, এবং মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ছিল তোঁ, তোহ্মে ইত্যাদি।

ঝ) সর্বনাম পদের সঙ্গে কর্তৃকারকের বহুবচনে রা বিভক্তি যুক্ত হত। —আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী। ইত্যাদি।

৩। ছন্দরীতির বৈশিষ্ট্য ঃ

পয়ার ছন্দ আদি মধ্য বাংলার প্রধান ছন্দ, যেমন—যমুনার তীরে রাধা/কদমের তলে = ৮ + ৬

তরল করিলে কেহ্নে/নয়ন যুগলে = ৮+ ৬

এছাড়া, নানা ছাঁদের ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি ছন্দের সুপ্রচুর নিদর্শন মেলে।

❑ অন্ত্যমধ্য বাংলা (Late Middle Bengali) ❑

এই যুগের ভাষা নানা ধারায় সমৃদ্ধ, যেমন—বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্য জীবনী, মনসা মঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, বিভিন্ন সংস্কৃতে গ্রন্থের অনুবাদ, আরাকানের মুসলমান কবিদের রচনা ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন ধারার বিভিন্ন রচনায় এই যুগের বাংলা ভাষার পর্যাপ্ত নিদর্শণ পাওয়া যায়।

১। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক) পদের অন্তে একক ব্যঞ্জনের পরে 'অ'কার লোপ— আর শুন্যানু আলো সই গোরভাবের কথা

খ) পদান্তে যুক্ত ব্যঞ্জনের পর অবস্থিত 'অ'কারের লোপ হয়নি অন্নবস্ত্র কতেক যোগাইব বারোমাস।

গ) পদান্তে অবস্থিত একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী অকার ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি লোপ পায়নি— বিশেষ বামনজাতি বড়ো দাগাদার।

ঘ) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দমধ্যস্থ স্বর লোপ পেয়েছে। — হরিদ্রা > হলাদ

ঙ) অপিনিহিতিজনিত স্বরের পরিবর্তন লক্ষিত হয় — বেগুন > বেউগন > বাইগন।

চ) মহাপ্রাণ নাসিক্য (হ-যুক্ত) অল্পপ্রাণ (ই-বিহীন) হতে আরম্ভ করেছিল, — আহ্মি > আমি, তুহ্মি > তুমি ইত্যাদি।

২। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল 'র'-এর ইত্যাদি।

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।

খ) য় - এ তে সপ্তমী বিভক্তি —

উইচারা খাই বনে জাতিতে ভাসুক।

গ) সাধারণ সদ্য অতীত কালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি ছিল হলাঙ — ইলাম — রচিলান্ত তোমার সঙ্গীতে।

Scanned with CamScanner

ঘ) সাধারণ ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল 'ইব' — তোমার বদলে আমি করিব পসার।

ঙ) মূল ক্রিয়ার অসমাপিকার রূপের সঙ্গে 'আছ' ধাতু যোগ করে যৌগিক কালের রূপ গঠন করা হত—

গোধিকা রাখ্যাছি বান্ধি দিয়া জাল দড়া।

(রাখ্যাছি > রাখিয়া + আছি এখানে √রাখ ও √আছ দুটি ধাতু আছে)

চ) সংস্কৃত কিছু নাম শব্দকে ক্রিয়ার ধাতু রূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করা হত। নমস্কার + ইলা = নমস্কারিলা।

ছ) মধ্য যুগে ছিল মুসলমান শাসিত। ফলে তাদের দ্বারা বাংলা ভাষার বহু আরবী ফারসী তূর্কী গৃহীত হয়েছে আরবী গজব আজব আদামি আইন কেতাব খাজনা ফারসী দার (ভাইদার) গিরি (বাবুগিরি) গোলাপ (গুলাব) ইত্যাদি, তূর্কী খাঁ খাতুন বিবি বেগম ইত্যাদি।

৩। ছন্দোরীতির বৈশিষ্ট্য ঃ

এই যুগের পয়ার ছন্দে ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ কাহিনি মূলক রচনা ছাড়া ও উচ্চাঙ্গের দার্শনিক রচনাতে পয়ার ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ছত্রের ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ ছিল। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব কবিতায় অপভ্রংশের চতুর্দশপদী ছন্দের ব্যবহার ছিল।

❑ আধুনিক বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ❑

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠকবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে, এই বছরটিতে বাংলা ভাষার মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা হয়। মোটামুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান কালপর্যন্ত বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের বিস্তৃতিকাল, আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—

১। যে গদ্য বাঙালীর দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রচলিত ছিল, সাহিত্যে তার প্রয়োগ সূচিত হল, অর্থাৎ গদ্য সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল।

২। সাহিত্যে ব্যবহৃত গদ্যের দুটি রীতি গড়ে উঠলো সাধু ও চলিত।

৩। সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণতর দীর্ঘ রূপ বজায় ছিল, যেমন—করিয়া, করিয়াছিল, তাহার, যাহার, হইতে ইত্যাদি, চলিত ভাষায় এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ প্রচলিত হল, যেমন—করে, করেছিল, তার, যার, হতে, থেকে ইত্যাদি।

৪। মধ্যযুগের বাংলার কোন কোন ক্ষেত্রে অপিনিহিত বা বিপর্যাসের ফলে শব্দ মধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হত (যেমন—করিয়া > কইর‍্যা) আধুনিক যুগের আদর্শ চালিত বাংলায় অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপের ধ্বনি পরিবর্তন অভিশ্রুতি সংঘটিত হল (কইর‍্যা > করে)।

৫। আধুনিক চলিত বাংলায় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত দুটি বিষম স্বরধ্বনি স্বরসঙ্গতির প্রক্রিয়ায় সমীভূত হয়ে একই রকম বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে পরিণত হল। যেমন— দিশি পটুয়া > পোটো ইত্যাদি

Scanned with CamScanner

৬। মূল ক্রিয়ার ধাতুর অনট (অন্) প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করে প্রথমে ক্রিয়াজাত বিশেষ্য পদ রচনা করা হয়। যেমন— গম + অনট (অন্য = গমন, গৈ + অনট = গান, গ্রহ + অনট = গ্রহণ, ইত্যাদি, তারপর তাকে পূর্বপদ রূপে গ্রহণ করে ক (কর) ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করে নানা যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। (যেমন—গমন করা, গ্রহণ করা, গান করা ইত্যাদি)

৭। আধুনিক বাংলায় দুটি সংযোজক অব্যয়ের (ও/এবং) ব্যবহার খুব বেশি।

৮। আধুনিক বাংলার বাক্য গঠনরীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—নঞর্থক অব্যয় না, নাই, নি বসে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে। যেমন—রামচন্দ্র সত্যভঙ্গ করেন নি। এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে, যেমন রামচন্দ্র সত্য ভঙ্গ না করে চিরকাল সৎপথে চলেছেন, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় এবং নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ারও আগে বসে, যেমন—মেয়েটি না স্নান করল, না খেলো, না ঘুমালো সারাদিন মন খারাপ করে বসে রইল।

৯। একাধিক সরল বাক্যকে সংযোজক অব্যয় দিয়ে যোগ করে যৌগিক বাক্য, রচনা করা যায়। যেমন—রাম চন্দ্র বনে গেলেন এবং পঞ্চবটীতে বাস করতে লাগলেন, এরকম সংযোজক অব্যয় দিয়ে যোগ না করে পূর্ববর্তী বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করে বাক্য দুটিকে যোগ করে একটি মাত্র সরল বাক্য রচনা করা যায়, এটি আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। যেমন—রামচন্দ্র বনে গিয়ে পঞ্চবটীতে বাস করতে লাগলেন।

১০। আধুনিক বাংলায় বহু ইংরেজী শব্দ গৃহীত হয়েছে। যেমন—চেয়ার (Chair) , টেবিল (Table), রেডিও (Radio) ইত্যাদি। কিছু ইংরেজী শব্দ আবার বাংলার ভাষার নিজস্ব উপাদানের সঙ্গে মিলে পরিবর্তিত হয়ে দেশীয় রূপ লাভ করেছে, যেমন—Lord > লাট, Chord (কার/লালকার, কালোকার) lantern > লণ্ঠন ইত্যাদি। শব্দ ছাড়াও কিছু কিছু বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দগুচ্ছ ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়া হয়েছে যেমন— University > বিশ্ববিদ্যালয় Wrist watch > হাত ঘড়ি, ইত্যাদি, ইংরাজী ছাড়াও অন্য ভাষা থেকে বহু শব্দ, আধুনিক বাংলায় গৃহীত হয়েছে। যেমন—পর্তুগীজ আনারস, আলপিন, আলমারি ইত্যাদি। ফরাসীর কুপন, বুর্জোয়া ইত্যাদি ; ইতালীয় গেজেট, জার্মান, ন্যাৎসী, জার, হিন্দী, লাগাতর বন্ধ, বাতাবরণ, জাঠা ইত্যাদি।

১১। ছন্দোরীতিতে নানা বৈচিত্র্য আধুনিক বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুরানো পয়ার ছন্দ থেকে অমিত্রাক্ষর ও গৈরিশ ছন্দের জন্ম তো হলই, আধুনিক কবিতার গদ্যছন্দের সূচনা হল। এছাড়া বাংলায় ইংরেজী ও সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহারও দেখা দিল।

উপভাষা

বিচিত্র পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় মানুষ। সকল মানুষের কর্ম আচার ব্যবহার যেমন ভিন্ন ভিন্ন তাঁদের মুখের ভাষাও ভিন্ন হবে সেটাই স্বাভাবিক এক এক ধরনের ধ্বনি সমষ্টি ও ধ্বনি সমাবেশ বিধিতে এক একটি জনগোষ্ঠী অভ্যস্ত। তাই এক একটি বিশিষ্ট ধ্বনি

Scanned with CamScanner

সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের ব্যবহারকারী জনসমষ্টিই হল এক একটি ভাষা সম্প্রদায়। কিন্তু এক একটি ভাষা সম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে ভাব বিনিময়ে করে সেই ভাষার রূপ ও সর্বত্র এক নয়। যেমন— পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবাংলার প্রচলিত ভাষা বাংলা, কিন্তু উচ্চারণ ও ভাষারীতি পুরোপুরি আলাদা। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য একে বলে আঞ্চলিক উপভাষা।

● উপভাষার সংজ্ঞা ঃ

উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ বিশেষ রূপ যা এক একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষার ধ্বনিগত রূপগত ও বিশিষ্ট বাগধারাগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐসব বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে, অথচ পার্থক্যটা যেন এত বেশি না হয় যাতে আঞ্চলিক রূপগুলির এক একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে ওঠে।

● উপভাষা সৃষ্টির কারণ ঃ

নদী থাকলে যেমন তার উপনদী থাকে এবং এই উপনদী সৃষ্টির পিছনে বিশেষ কারণও বিদ্যমান। অনুরূপ প্রতিটি ভাষার উপভাষা থাকবে তা যেমন চিরায়ত সত্য সেই সাথে উপভাষা সৃষ্টির পিছনে বিশেষ কারণ বর্তমান। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি নির্দেশ করা যেতে পারে।

প্রথমত ঃ অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন ভাষার উপভাষা সৃষ্টি হতে পারে। মানুষ তাঁর নিজের নিজের অঞ্চলে ঘরোয়া কথায় আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু সাহিত্য শিক্ষায় আইন আদলতে বক্তৃতায়, বেতার, সংবাদপত্রে আদর্শ ভাষা ব্যবহার করে। এইরকমভাবে প্রায়ই দেখা যায় একটি আদর্শ ভাষার এলাকার মধ্যে একাধিক উপভাষা প্রচলিত। তবে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— সাধারণ লোক-সাহিত্য উপভাষায় রচিত হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ সামাজিক স্তরভেদেও উপভাষার সৃষ্টি হতে পারে, ব্রাহ্মণ, উকিল, রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে শ্রমজীবী, দাগী অপরাধী কিংবা গুন্ডার ভাষায় পার্থক্য বা উচ্চারণের বৈপরীত্য চোখে পড়ার মত। একই ভাষার সামাজিক স্তরভেদে এই পার্থক্যকে সামাজিক উপভাষা বলা হয়।

আবার, সমাজে ইতর জনের ভাষা, অর্থাৎ মস্তান ও অপরাধ জগতের মানুষের ভাষা অনেকটা সাঙ্কেতিক ধরণের। অপরাধীদের এই ইঙ্গিত পূর্ণ ভাষাকে সঙ্কেত ভাষা বলে। এই ভাষা শিক্ষিত ভদ্রজনের কাছে বিশেষনিন্দনীয় বলে একে ইতর শব্দ বলে। যেমন মাল খাওয়া (মদ্য পানকরা) বাঁশ দেওয়া (ক্ষতি করা), চামচে (তোষামোদ কারী), বড়ি ফেলা (ঘুমানো), আলুর দোষ (অবৈধ প্রণয়ের ঝোঁক) ইত্যাদি।

তৃতীয়ত ঃ শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সর্বসাধারণের দ্রুত উচ্চারণের ও ব্যবহারের সুবিধার জন্য অনেকে প্রায় বড় শব্দের অংশ বিশেষ কোটে বাদ দিয়ে শুধু তার একটা অংশকেই গোটা শব্দের অর্থে ব্যবহার করা হয়, একে খন্ডিত শব্দ বলে। চলিত ভাষায় এর প্রয়োগ বেশি যেমন—মিনি (Minimum), ম্যাকসি (Maximum), ভেজ (Vegetarian), কংগ্রেট (Congratulation)।

Scanned with CamScanner

চতুর্থতঃ ব্যবহারের সুবিধার জন্যে অনেক সময় একাধিক শব্দে গঠিত একটি নামকে বা পদ গুচ্ছকে ছোট করা হয় কেবলমাত্র সেই সমস্ত শব্দের আদ্যাক্ষর নিয়ে। এই নব গঠিত শব্দের দ্বারা উপভাষার সৃষ্টি হতে পারে। একে মুণ্ডমাল শব্দ বলে। যেমন— ওয়াবকুটা = WBCUTA (West Bengal College and University Teachers Association) ইউনেস্কো UNESCO (United Nation Education and Cultural Organisation) নেফা NEFA (North Eastern Frontier Area), তদেব = তৎ +এব, C.P.M ইত্যাদি।

● **বাংলার উপভাষা ঃ**

পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক সব ভাষাতেই আছে নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য তথা—আঞ্চলিক উপভাষা। বাংলা ভাষায় তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলা ভাষার প্রধান পাঁচটি উপভাষা আছে।

যথা—১) রাঢ়ী = মধ্য পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া, কলকাতা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ,।

২) বঙ্গালী = পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ—ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম।

৩) বরেন্দ্রী = উত্তরবঙ্গ মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী।

৪) ঝাড়খন্ডী = দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ মানভূম, সিংভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর (দক্ষিণ, পশ্চিম)।

৫) কামরূপী বা রাজবংশী = উত্তর পূর্ববঙ্গ জলপাইগুড়ি, রংপুর, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা।

❑ রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ❑

১। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১) আদিস্বরে অ-ধ্বনি ও ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়া রাঢ়ী উপভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য। যথাঃ অতি > ওতি ; মধু > মোধু ; শয্যা > শোয্যা, রবি > রোবি। অধ্বনির অব্যহিত পরে হস্ ধ্বনি থাকলে সাধারণত অ > ও হয় না। দল > দোল পথ > পোথ হয় না, ব্যতিক্রম বন > বোন, মন > মোন।

২) অভিশ্রুতি রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট, যেমন— করিয়া > কইর‍্যা > করে, পড়িয়া > পইড়্যা > পড়ে।

৩) পাশাপাশি বিষম স্বরধ্বনি সমীকৃত হয়ে যাওয়া রাঢ়ীর অন্যতম লক্ষণ। এই প্রক্রিয়ার নাম স্বরসঙ্গাতি, যেমন— দেশী > দিশি, উড়ানী > উড়ুনি।

৪) নাসিক্যভবন, স্বতোনাসিক্যীভবন—রাঢ়ীর লক্ষণ। শব্দের যুক্ত ব্যঞ্জনস্থিত নাসিক্যধ্বনির চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া নাসিক্যীভবনের লক্ষণ। যেমন—রন্ধ > রাঁধ, ছন্দ > ছাঁদ, চন্দ্র > চাঁদ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অহেতুক চন্দ্রবিন্দুর আগমন ঘটে যেমনঃ হাঁসপাতাল, পুঁথি।

Scanned with CamScanner

৫) ল-ধ্বনি ন্-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়া যেমন— লোহা > নোয়া, লবন > নুন, লুচি > নুচি ।

৬) অল্পপ্রাণী ভবন রাঢ়ীর ধ্বনিতাত্ত্বিক লক্ষণ। শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়, যেমন— দুধ > দুদ্, বাঘ > বাগ, চোখ > চোক, নখ > নোক।

৭) শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত না থাকলে কখনও কখনও মহাপ্রাণী ভবন ঘটে। যেমন—কাক > কাগ, রাতদিন > রাদ্দিন।

২। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১) কর্তৃকারক ছাড়া অন্যকারকে বহুবচনে—'দের' বিভক্তি যোগ হয়, যেমন ঃ কর্মকারক—আমাদের বইদাও, করণকারক—তোমাদের দ্বারা একাজ হবে না।

২) রাঢ়ীতে গৌণকর্মের বিভক্তি হচ্ছে 'ক' এবং মুখ্য কর্মে কোন বিভক্তি যোগ হয় না। যেমন—আমি রামকে (গৌণকর্ম) টাকা (মুখ্যকর্ম) ধার দিয়েছি।

৩) অধিকরণ কারকে 'এ' এবং 'তে' বিভক্তি প্রয়োগ হয়, যেমন—ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।

৪) সদ্য অতীত কালে প্রথম পুরুষের অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল—'লো'। যেমন—সে বললো। কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল 'লো' যেমন—সে বললে, সদ্য অতীত কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল 'লুম'। যেমনঃ আমি বললুম।

৫) ক্রিয়ার মূল ধাতুর সঙ্গে 'আছ' ধাতু যোগ করে সেই 'আছ' ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতের রূপ গঠন করা হয়। যেমন—কর + ছি = করছি, কর + ছিল = করছিল ইত্যাদি।

○ রাঢ়ী উপভাষার নিদর্শন (কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা) ঃ একজন লোকের ছটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটটি বাপকে বললে বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে ভাগ আমি পাবো, তা আমাকে দিন। তাতে তাদের বাপ তার বিষয় আশয় তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

❑ বঙ্গালী উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ❑

১। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১) অপিনিহিতির রূপটি বঙ্গালীতে রক্ষিত হয়। যথাঃ—আজি > আইজ, করিয়া > কইর‍্যা, বাক্য > বাইক্ক, যজ্ঞ > যইগ্গ।

২) নাসিক্য ধ্বনির প্রভাবে চন্দ্রবিন্দুর আগমন ঘটেনা, নাসিক্য ধ্বনি মোটামুটি অবিকৃত থাকে। যথাঃ চন্দ্র > চান্দ, স্কন্ধ > কন্ধে।

৩) 'এ'ধ্বনি 'অ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, যেমনঃ দেশ > দ্যাশ, শেষ > শ্যাষ।

৪) ও > উ, যেমন— লোক > লুক, দোষ > দুষ। সোদপুর > সুদপুর।

৫) ঘৃষ্ট ধ্বনি চ্ ছ্ জ্ উষ্মধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— খেয়েছে > খাইসে, জানতে পারা > জানতি পারা।

৬) 'স' ও শ' স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয়, যেমন—শাক > হাগ, সে > হে, বোসো > বহ।

Scanned with CamScanner

৭) 'হ' র স্থানে 'অ' হয়। যেমন—হয় > অয়।

৮) তাড়িত ধ্বনি 'ড়' কম্পিত ধ্বনি 'র' তে পরিণত হয়। যেমন—বাড়ি > বারি, পড়াশোন > পরাহোনা।

২। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১) কর্তৃকারক 'এ'-বিভক্তিযুক্ত হয়, যেমনঃ— রামেখায়, ভূতে ধরে।

২) সকর্মক ক্রিয়াযুক্ত বাক্যে গৌণকর্মে 'রে' বিভক্তি হয়। সম্প্রদান কারকেও 'রে' বিভক্তি হয়। যেমনঃ—আমারে দাও।

৩) অধিকরণ কারকে বিভক্তি হল 'ত' যেমন—বাড়ীত থাকুম।

৪) কারকে বহুবচনের বিভক্তি হল 'গো' আমাগো যাইতে দিবা না?

৫) সদ্য অতীতকালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ারূপ 'লাম' যুক্ত হয়। যেমনঃ ভাত খাইলাম। রাত জাগিলাম।

৬) অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত যৌগিক ক্রিয়া সম্পন্ন কালে ক্রিয়াটি আগে বসে অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে। যেমন—হগ গ্যাসে গিয়া (সে চলে গেছে)।

৭) মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি হল 'বা'। যেমনঃ তুমি যাবা না?

৮) উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি হল— উম, ওমু আমি যামু, আমি খেলুম (খেলব না)।

৯) নঞর্থক অব্যয় 'নি' তে রূপান্তরিত হয়। যেমন— তুমি যাও নাই।

○ বাঙালী উপভাষার নিদর্শন ঃ

ঢাকা ঃ য়্যাক জনের দুইভী ছাওয়াল আছিলো। তাগো টমদ্দে ছোটডি তার বাপেরে কোলো, 'বাপ' আমার বাগে যে বিত্তি ব্যাসাদ তা আমারে দ্যাও। তাতে তিনি তার বিষয় সম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বানুটা দিল্যান।

❑ বরেন্দ্রী উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ❑

উত্তরবঙ্গের উপভাষা বরেন্দ্রী ও পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা রাটীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। কারণ এ দুটি প্রথমে একটিই উপভাষা ছিল। পরে উত্তরবঙ্গের ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষা বঙ্গালীর ও বিহারের ভাষা বিহারীর প্রভাব পড়ায় উত্তরবঙ্গের ভাষায় কিছু স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে এবং একটি স্বতন্ত্র উপভাষার সৃষ্টি হয়।

১। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১) বারেন্দ্রীর স্বরধ্বনি অনেকটা রাঢ়ীরই মতো। আনুমানিক স্বরধ্বনি রাটীর মতো বরেন্দ্রীতেও রক্ষিত আছে।

২) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (যেমন ঘ্, ঝ, ঢ) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে, শব্দের মধ্যে ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই অল্প প্রাণ হয়ে গেছে যেমন— বাগ্, সাঁজ।

৩) রাঢ়ীতে সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে, কিন্তু বরেন্দ্রীতে শ্বাসাঘাত অতখানি সুনির্দিষ্ট স্থানে পড়ে না।

৪) বাঙালী উপভাষার প্রভাবে বরেন্দ্রীতে জ্ (j) প্রায়ই জ্ (j) রূপে উচ্চারিত হয়।

Scanned with CamScanner

৫) শব্দের আদিতে যেখানে 'র' থাকার কথা নয় সেখানে 'র'-এর আগমন হয়। যেমন—আম > রাম, আবার যেখানে 'র' থাকার কথা সেখানে 'র' লোপ পায় যেমন রস > অস। ফলে আমের রস উত্তরবঙ্গের উচ্চারণে দাঁড়ায় 'রামের অস'।

২। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১) বরেন্দ্রীতে অধিকরণ কারকে 'ত' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন ঃ বাড়িত, দেশত, ঘরত।

২) সামান্য অতীতকালে উত্তমপুরুষে 'লাম' বিভক্তি যোগ হয়। যেমনঃ— খেলাম, পেলাম, গেলাম।

○ বরেন্দ্রী উপভাষার নিদর্শন ঃ

মালদহঃ য়্যাক শেন্ মানুষের দুটা ব্যাটা আছলো। তার ঘোর বিচে ছোট্কা আপনার বাবাক্ কাহলে, বাব ধন করির যে হিস্যা হামি পামু, সে হামাক দে, তাৎ তাঁই তারঘোরকে মালমাত্তা সব ব্যাঁটা দিলে।

❑ ঝাড়খণ্ডী উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ❑

১। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১) আনুনাসিক স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন—চাঁ, হইঁছে, উঁট, আঁটা, পাকা।

২) 'ও'-কারের 'অ'-কার প্রবণতা ব্যাপক, যেমন—(লোক) লক্, (চোর) চর।

৩) অপিনিহিতি ও বিপর্যাসের ফলে শব্দের মধ্যে আগত বা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ থেকে যায়, তার লোপ বা অভিশ্রুতি জনিত পরিবর্তন হয় না। যেমনঃ—সন্ধ্যা > সাঁইঝ > সাঁঝ কালি > কাইল > কাল রাতি > রাইত > রাত।

৪) অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—দূর > ধূর, পতাকা > ফাত্কা, বুড়ামানুষ > বুড়হা মানহূষ।

২। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১) নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারের রীতি সংস্কৃতে ছিল। এইরীতি অনুসারে বাংলাতেও নিমিত্তার্থে ব্যবহৃত বিভক্তিকে যদি চতুর্থী বিভক্তি বলি তবে বলতে পারি এই বিভক্তি—'কে' ঝাড়খণ্ডীতে ব্যবহৃত হয়। যেমন—বেলা যে পড়ে এল জলকে (জলের পিনিও = জল আনতে) চল,

২) নামধাতুর বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডীর আরো একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন—এবার শীতে জাড়াবে (নামধাতু 'জাড়')। হমর ঘরে চর সাঁদান্ন ছিল' (সিঁধিয়েছিল)।

৩) ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, যেমন—যাবেক নাই ?

৪) যৌগিক ক্রিয়াপদে 'আছ' ধাতুর বদলে 'বট্' ধাতুর ব্যবহার কোথাও কোথাও দেখা যায়। যেমন—কবি বটে।

৫) সম্বন্ধপদে ও অধিকরণে শূন্যবিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। যেমন—সম্বন্ধঃ-ঘাটশিলা (ঘাটশিলার) শাড়ী কুনি (কুনির) মনে নাই লাগে। অধিকরণঃ-রাইত (রাতে) ছিলি ঘাটশিলা টাঁইড়ে।

Scanned with CamScanner

৬) অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন হল নু 'ল, রু মায়ের লে মাউসীর দরদ' (মায়ের চেয়ে মাসির দরদ)।

৭) অধিকরণের বিভক্তি হল—'কে'। আইজ রাইকে ভারি জাড়াবে। বাক্য গঠনগত বৈশিষ্ট্যঃ—

৮) নেতিবাচক বাক্যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন—টুনটুকু বোনে নাই দিলি (টুনটুকু কেন দিলি ন?)।

○ **ঝাড়খন্ডী উপভাষার নিদর্শন ঃ**

মানভূম—এক লোকের দুটা বেটা ছিল ; তাদের মাঝে ছুটু বেটা তার বাপকে বল্লেক, বাপ্ হে, আমাদের দৌলতের যা হিস্যা আমি পাব তা আমাকে দাও'। এতে তার বাপ আপন দৌলৎ বাখরা করেক তার হিস্যা তাকে দিলেক।

❑ কামরূপী (রাজবংশী) উপভাষার বৈশিষ্ট্য ❑

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য বেশী, কারণ কামরূপী হল উত্তরপূর্ব বঙ্গের উপভাষা এবং বরেন্দ্রী হল উত্তরবঙ্গের উপভাষা, সুতরাং দুয়ের মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য আছে, কিন্তু কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর সাদৃশ্য খুবই কম, কারণ বরেন্দ্রী মূলত রাঢ়ীর একটি বিভাগ, বরং কামরূপীর সঙ্গে সাদৃশ্য বেশি বঙ্গালীর। কামরূপী হল কামরূপের (আসামের) নিকটবর্তী বঙ্গালীরই রূপান্তর।

১। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (ঘ, ঝ, ঢ়, ধ, ভ) শুধু শব্দের তাগিদে বজায় আছে। যেমন—ধরিল, ভরা, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে। যেমন—সমঝা—সমঝি সম্‌জা > সমজি।

২) বঙ্গালীর মতো কামরূপীতেও 'ড়' হয়েছে 'র' এবং 'ঢ়' হয়েছে 'রহ্'। কিন্তু এই প্রবণতা সর্বত্র দেখা যায় না। কুচবিহারের উচ্চারণে 'ড়' অপরিবর্তিত আছে।

৩) চ, জ, স, শ্ হয়েছে যথাক্রমে ৎস, জ, হ, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি সর্বত্র দেখা যায় না। গোয়াল পাড়া রংপুরের উচ্চারণে 'স' রক্ষিত আছে। যেমন—সতেরো > সাতির, সমঝাবার > সমজেবার, দিনাজপুরে 'চ' অপরিবর্তিত, যেমন—বাচ্চা।

৪) রাঢ়ীতে যেমন সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে কামরূপীতে তেমন নয়, কামরূপীতে শ্বাসাঘাত শব্দের মধ্যে এবং অন্ত্যেও পড়ে।

৫) সাধারণত 'ও' কখ্নো কখনো ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন—কোন > কুন্, তোমার > তুমার, তবে এই প্রবনতা সর্বত্র সুলভ নয়।

২। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১) সামান্য অতীতে উত্তমপুরুষের 'সু' এবং প্রথম পুরুষে 'ইল' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—সেবা কনু (সেবা করলাম), কহিল, ধরিল।

২) উত্তম পুরুষের একবচনের সর্বনাম হল মুই, হাম, যেমন—মুই না পারং, হাম কর বাড়ি তিস্তার চরত।

Scanned with CamScanner

৩) অধিকরণের বিভক্তি হল 'ত', যেমন—ঘরত, পাছত, চরত,

৪) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি হল 'র', 'ক', যেমন—বাপোক (বাপের), ছাগলের।

৫) গৌণকর্মের বিভক্তি হল 'ক', যেমন—বাপক্, (বাপকে), হামাক্ (আমাকে)

৬) নঞর্থক শব্দ ক্রিয়ার আগে বসে, অন্যপক্ষে রাঢ়ী বঙ্গালীতে 'না' ক্রিয়ার পরে বসে, যেমনঃ না পার, না জাম না ২৭। রাঢ়ীতে 'লাইর্ব' জাতীয় ব্যবহার ছাড়া এরকম প্রয়োগ নেই।

○ কামরূপী উপভাষার নিদর্শন ঃ

কোচবিহার—একজন মান্সির দুই কোনা বেটা আছিল. তার মদ্দে ছোটজন উয়ার বাপোক্ কইল, 'রা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইম্ তাক্ মোক্ দেন।' তাতে তাঁয় তার মালমাত্তা দোনো ব্যাটাক্ বা টিয়া চিরিয়া দিল।

সাধু ও চলিত ভাষা

ভাষার সংজ্ঞা ঃ বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টি হল ভাষা যেমনঃ—বাংলা, হিন্দী আরবী, ফারসি, ইংরাজি ইত্যাদি।

উপভাষার সংজ্ঞা ঃ একই ভাষাগোষ্ঠীর অঞ্চলভেদে দৈনন্দিন ব্যবহারিক কাজে উচ্চারিত মৌখিক ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে ভাষা তাহল উপভাষা।

উপভাষা পাঁচ প্রকার ঃ ১) রাঢ়ি ২) ঝাড়খন্ডি ৩) বরেন্দ্রী ৪) কামরূপী বা রাজবংশী ৫) বঙ্গালী।

ভাষা দুপ্রকার ঃ সাধুভাষা ও চলিত ভাষা।

❑ সাধুভাষা ❑

সংস্কৃত শব্দবহুল, সন্ধিসমাস সমাকীর্ণ, সুষ্ঠু, মার্জিত, শিক্ষিতজন বোধ্য বাংলাগদ্যের এক কৃত্রিম ভাষারীতির নাম হল সাধুভাষা। সাধুভাষা সম্পূর্ণ লেখ্যভাষা বা সাহিত্যের ভাষা। বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে গদ্যসাহিত্য রচিত হয়েছিল সাধু ভাষায়। সে সময় এই গদ্য সাহিত্য রচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যাঁরা তাঁরা অনেকেই সংস্কৃত জানতেন। ফলে সাহিত্যের জন্ম লগ্ন থেকেই সাহিত্যের ভাষা বা সাধুভাষায় ব্যাপক তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

○ সাধু ভাষার দৃষ্টান্ত ঃ

১) রাজা এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু সহসা তাহাদের সম্মুখে না গিয়া এক বৃক্ষের অন্তরালে সস্নেহ নয়নে সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় সেই বালক, কই কি খেলনা দিবে দাও বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিল, (বিদ্যাসাগর/ভরত ও দুষ্মন্তের মিলন)

২) ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালীবদল করিবার কথা মনেই আসে না ; তাই নূতনের চালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে (রবীন্দ্রনাথ/ অসন্তোষের কারণ)

Scanned with CamScanner

○ সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

১) তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ

২) সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদমালিকার প্রাধান্য

৩) অনুসর্গের পূর্ণাঙ্গ, রূপের প্রয়োগ, যেমন--হইতে, চাহিতে, বলিয়া ;

৪) বাক্যগঠন ও পদবিন্যাস ব্যাকরণ নিবন্ধ রীতি অনুসারী।

৫) অসমাপিকা এবং সমাপিকা ক্রিয়া পদের যথাযথ প্রয়োগ, যেমন—হইয়া, করিতেছিল, কাটিয়া ফেলিল।

৬) সর্বনাম পদের পূর্ণাঙ্গ রূপের ব্যবহার, যেমন—তাহার, তাহাদের

৭) ভাষামার্জিত, গাম্ভীর্যপূর্ণ, তবে মুখের ভাষা থেকে বহু দূরবর্তী।

❑ শিষ্ট চলিত ভাষা ❑

শহর কলকাতা বঙ্গাদেশের রাজধানী থাকায় এবং সমগ্র বাঙালী জাতির শিক্ষার ও মানসিক উৎকর্ষের কেন্দ্র হওয়ায়, এই অঞ্চলের জনসাধারণ মুখের ভাষায় যে, লিখিত সাহিত্যিক ভাষারীতি তৈরি করেছে তাকেই আমরা বলি বাংলা গদ্যের শিষ্ট চলিতভাষা। এই চলিত ভাষা কলকাতা ও ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের কথ্য ভাষারই লিখিতরূপ, চলিত ভাষার উপযোগিতা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারে না। ও ভাষার যেমন জোর যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ঘোরাও সেদিকে ঘোরে, তেমন কোন তৈরি ভাষা কোন কালে হবে না।"

স্থান বা অঞ্চল ভেদে কথ্যভাষার যে রূপান্তর ঘটে তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে শিষ্ট চলিত ভাষা। লিখিত রূপ পাওয়া এই ভাষা আধুনিক কাব্য বা সাহিত্যে সর্বজনগ্রাহ্য, সর্বজনবোধ্য এক জীবন্ত ভাষার রূপ নিয়েছে। তৎসম, তদ্ভব, দেশি বিদেশি শব্দের প্রয়োগে চলিত ভাষা প্রাঞ্জল এবং প্রসাদগুণ সম্পন্ন।

○ চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত ঃ

১) প্রায় একশো বছর হল পাশ্চাত্য জাতির হাতে ঘা খেয়ে জাপান ঠিক করল, যে বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য প্রতীচ্য এত শক্তিমান হয়েছে সে জ্ঞান ও সে সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। (সত্যেন্দ্রনাথ বসুঃ মাতৃভাষা)

২) কাবুল থেকে যতগুলো কয়েদি নিয়ে বেরিয়েছিল জালালাবাদে যদি সেই সংখ্যা দেখাতে না পারে তবে তাদের কি শাস্তি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের আইনজ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না (সৈয়দ মুজতবা আলি/যাত্রাপথে)

○ চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

১) তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি এবং বিদেশি শব্দের প্রাধান্য

২) সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার, যেমন—যারা < যাহারা ; তারা < তাহারা, তাদের < তাহাদের।

৩) ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত নয়, যেমন—সমাপিকা ঃ আসছিল < আসিতেছিল লিখছিলাম < লিখিতেছিলাম ; অসমাপিকা ঃ লয়ে < লইয়া ; চলছে < চলিতেছে।

৪) অনুসর্গের রূপান্তর ঘটে, যেমন ঃ কাছে < নিকটে, থাকিয়া > থেকে

৫) পদ বিন্যাস এবং বাক্যের গঠনভঙ্গিতে ও সাধুভাষার সঙ্গে পার্থক্য

Scanned with CamScanner

৬) কঠিন তৎসম শব্দের বদলে সরল এবং পরিচিত শব্দের প্রয়োগ যেমন— জলাশয় > জলা, পুষ্করিণী > পুকুর, তিমির > আঁধার।

৭) চলিত ভাষা অনেক বেশি সাবলীল গতিময়, প্রাঞ্জল ও সজীব।

৮) ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্য যথা— শোঁ শোঁ, গম্ গম্, ঝম্ ঝম্।

○ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য ঃ

সাধু ও চলিত ভাষার আকারগত পার্থক্য—

১। **ক্রিয়াপদের পার্থক্য ঃ** সাধুভাষায় ক্রিয়ার রূপ দীর্ঘ, চলিত ভাষায় হ্রস্ব।

ক) অসমাপিকা ক্রিয়া ঃ বলিয়া > বলে, কাটিয়া > কেটে আসিয়া > এসে শুনিয়া > শুনে।

খ) সমাপিকা ক্রিয়া ঃ .চলিতে ছিল > চলছিল, লিখিতে ছিলাম > লিখছিলাম, খাইতাম > খেতাম, বসিয়া পড়িল > বসে পড়ল।

গ) সকর্মক ক্রিয়াঃ করিলে > করল, মরিলে > মারলে,

ঘ) অকর্মক ক্রিয়া ঃ ঘুমাইয়া > ঘুমিয়ে ফুটিল > ফুটল,

ঙ) যৌগিক ও সংযোগ ঃ পাঠ করিতে > পড়তে, লড়াই করিতে > লড়তে, পলায়ন করিল > পালাল, দর্শন করিয়া > দেখে।

২। **সর্বনাম পদের পার্থক্য ঃ** সাধুভাষায় সর্বনাম পদ ব্যাপক আর চলিত ভাষায় সংক্ষিপ্ত, যেমন — যাহাদের > যাদের, কাহাদের > কাদের, উহা > ও, কেহ > কেউ, তাহাকে > তাকে, যাহা > যা, কাহারা > কারা, আমাদিগকে > আমাদিকে > আমাদিগের আমাদের।

৩। **অনুসর্গের প্রয়োগে পার্থক্য ঃ** ধ্বনি পরিবর্তন বা ধ্বনিলোপ অথবা পৃথক শব্দ ব্যবহার করে সাধুথেকে চলিত ভাষায় অনুসর্গের রূপ পরিবর্তন ঘটে।

যেমন ঃ উপর > ওপর, সমভিব্যাহারে সঙ্গে, চাহিতে > চাইতে, নিমিত্ত > জন্য > জন্যে, হইয়া > হয়ে, ব্যতীত > ছাড়া প্রভৃতি।

৪। **অব্যয়ের প্রয়োগে পার্থক্য ঃ** চলিত রীতিতে অব্যয় গুলির সহজ সরলরূপদেখা যায়। কিন্তু সাধুরীতিতে তা হয় না। যেমনঃ বরঞ্চ > বরং, তথাপি > তবু, ইদানিং > এখন। এছাড়া খাঁটি বাংলার এবং বিদেশী ভাষা থেকে আগত অব্যয় চলিত রীতিতে প্রয়োগ করা হয়। যেমন ঃ (খাঁটি বাংলা) আর, আচ্ছা, মতো, ছি। বিদেশী সাবাশ নাগাদ।

৫। **অর্ধতৎসম এবং তদ্ভব শব্দের ব্যবহার ঃ** তৎসম শব্দ থেকে ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্রে যেসব অর্ধতৎসম বা তদ্ভব শব্দ এসেছে সেগুলির ব্যবহার, যেমন ঃ পুত্র > পুত্তুর, বৈবাহিক > বেয়াই, ব্রাহ্মন > বামুন, প্রদীপ > পিদিম, দুর্গা > দুগ্গা ইত্যাদি।

৬। **খাঁটি বাংলাও বিদেশী শব্দের ঃ** সাধুভাষা যেসব তৎসম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় চলিত ভাষায় সেগুলির পরিবর্তে খাঁটি বাংলা, বিদেশী শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন ঃ (খাঁটিবাংলা) ট্যাঁক, পেট, ঢোল মুড়ি ভেঁপু খোঁপা। (বিদেশী)— স্কুল, পুলিশ, টেবিল, চেয়ার, বেহায়া, নবাব, রুমাল।

৭। **সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের সরলীকরণ ঃ** চলিত ভাষায় সন্ধি ও সমাসবদ্ধ দীর্ঘ পদকে ভেঙে সহজ সবল করা হয়। যেমন ঃ অশ্রু বিসর্জন > চোখের জল ফেলা, ভীতি প্রদর্শন > ভয় দেখানো, সন্দেহ ভঞ্জনার্থ > সন্দেহ দূরকরার জন্যে, গবাক্ষ > জানালা, কিঞ্চিনমাত্র > কিছু মাত্র, নিকটবর্তী > কাছাকাছি।

৮। **পদবিন্যাস ও বাক্যগঠন রীতির পার্থক্য ঃ** সাধু রীতিতে ক্রিয়াপদটি বাক্যের

Scanned with CamScanner

শেষে বসে, কিন্তু চলিত রীতিতে সেটি অনেক সময়ে বাক্যের মধ্যে চলে আসে। যেমন (১) বৈকালের রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে (সাধু) ; বিকেলের রাঙারোদ অলসভাবে জড়িয়ে আছে গাছটির মাথায় (চলিত)।

৯। **বিশেষ্য ও বিশেষণগত তফাৎ** ঃ সাধু ভাষায় সাধারণত তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে চলিত রীতিতে তদ্ভব দেশী ও আরবী ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

যেমন শিকা > শিকে, ফিতা > ফিতে, কৃপন > কিপটে। সাধুরীতিতে বিশেষণ প্রয়োগে একটু স্ত্রীলিঙ্গের দিকে ঝোঁক দেখা যায়, যথা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা, শস্য শালিনী বসুন্ধরা। বসুন্ধরা ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির সাধু এবং চলিত রূপের পার্থক্য লক্ষণীয় ঃ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
ষোড়শ	ষোলো	অবিচ্ছিন্ন	একটানা	কম্পিত হস্তে	কাঁপাকাঁপা হাতে
পিপাসা	তেষ্টা	অশ্রুধারা	চোখের জল	পুনরুজ্জীবিত	আবার জেগে ওঠা
অন্যমনস্ক	আনমনা	ভবন	বাড়ি	ব্যতীত	ছাড়া
মৃন্ময়	মেটে	কৌতুক	মজা	নদীবক্ষে	নদীর বুকে
হতভাগ্য	হতভাগা	কিঞ্চিৎ	কিছু	অবলোকন	দেখা
সন্নিভ	মতো	কুপিত হইয়া	রেগে গিয়ে	মন্থর পদে	ধীরে ধীরে
পূর্বাহ্ন	সকালবেলা	কুটির	কুঁড়েঘর	প্রস্থান করিল	চলে গেল,
ত্বদীয়	তোমার	ক্রোড়	কোল	জীবন্ত	জ্যান্ত
মাতৃহীন	মাহারা	যৎপরন্যাস্তি	যার পর নাই	স্বর্ণ	সোনা
হাস্যময়	হাসিভরা	ইতস্তত	এদিক ওদিক	নিরীক্ষণ	দেখা
সামঞ্জস্য	মিল	অপরাহ্ন	বিকেলবেলা	তদীয়	তার

প্রঃ। বাংলা শব্দভাণ্ডারে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ স্থান পেয়েছে উদাহরণের সাহায্যে সেগুলির শ্রেণী-পরিচয় ও সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

ভাষার গভীরতা নির্নীত হয় তার প্রকাশ ক্ষমতার উপর। আর এই প্রকাশ ক্ষমতার বৈচিত্র্য প্রমানিত হয় ভাষার শব্দ সম্পদের দ্বারাই। ভাষার এই শব্দসম্পদ বা শব্দ ভাণ্ডার তিনভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে থাকে। যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে, কৃতঋণ সূত্রে আর নতুন শব্দ সৃষ্টি সূত্রে এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের উৎসগত দিক নির্ণয়ে ক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। যথা ১। মৌলিক বা নিজস্ব ২। আগন্তুক বা কৃতঋণ ৩। নব গঠিত।

১। **মৌলিক বা নিজস্ব** ঃ যে সব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলায় এসেছে সেগুলিকেই মৌলিক শব্দ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আবার এই মৌলিক বা নিজস্ব শব্দকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। (ক) তৎসম, (খ) অর্ধতৎসম, (গ) তদ্ভব।

(ক) **তৎসম** ঃ যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক/সংস্কৃত) থেকে অপরিবর্তিত ভাবে বাংলায় এসেছে সেগুলিকেই তৎসম শব্দ বলে। (তৎসম অর্থাৎ ঠিক তার মত)। যেমন—জল, বায়ু, কৃষ্ণ, সূর্য, মৃত্যু, নারী, পুরুষ, লতা ইত্যাদি

Scanned with CamScanner

আবার তৎসম শব্দ গুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। i) সিদ্ধ তৎসম, ii) অসিদ্ধ তৎসম।

[i] সিদ্ধ তৎসম ঃ যে সব শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যেগুলি ব্যাকরণসিদ্ধ সেগুলি হোল সিদ্ধ তৎসম, যেমন—সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, নর, লতা ইত্যাদি।

[ii] অসিদ্ধ তৎসম ঃ যে সব শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না ও ব্যাকরণ সিদ্ধ নয় অথচ প্রাচীন কালে মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল সেটাকেই অসিদ্ধ তৎসম শব্দ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন—কৃষাণ, ঘর, চল, ডাল, (বৃক্ষশাখা) ইত্যাদি।

(খ) **অর্ধতৎসম** ঃ যে সব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যথেকে মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃতের মাধ্যমে না এসে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং আসার পরে কিছুটা পরিবর্তন ও বিকৃতি লাভ করেছে সেগুলিই অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ। যেমন—কৃষ্ণ > কেষ্ট, নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন, ক্ষুধা >খিদে, রাত্রি > রাত্তির ইত্যাদি।

(গ) **তদ্ভব শব্দ** ঃ যে সব শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলায় আসেনি, মধ্যবর্তী পর্বে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে তাদের তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন—সং-ইন্দ্রাগার > প্রাঃ ইন্দাআর > বাং-ইন্দারা/সং-একাদশ > প্রাঃ > এগগারহ > বাং-এগার/কৃষ্ণ > কনহ > কানু/ধর্ম্ম > ধম্ম > ধাম ইত্যাদি। এই তদ্ভব শব্দকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। i) নিজস্ব ii) কৃতঋণ বা বিদেশী।

[i] নিজস্ব ঃ যে সব তদ্ভব শব্দ যথার্থই বৈদিক বা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলে এসেছে সেগুলিকে নিজস্ব তদ্ভব বলা হয়। যেমন—ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইঁদারা উপাধ্যায় > উবজঝাঅ > ওঝা ইত্যাদি।

[ii] কৃতঋণ ঃ যে সব শব্দ প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় অন্যান্য ভাষাবংশের ভাষায় আশ্রয় নিয়ে পরে তা প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত বাংলায় এসেছে সেগুলিকে কৃতঋণ বা বিদেশী তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন—গ্রীক-দ্রাখমে (মুদ্রা > সংভ্রম্য) প্রা-দম্ম > বাং-দাম/তামিল-পিল্লে > সং-পিল্লিক > প্রা-পিল্লিঅ > বাংপিলে। অস্ট্রিক = ঢক্ক > ঢক্ক > ঢাকা/মর্দ্দল = তুর্ক > তরুক্ক > তুরুক ইত্যাদি। অতএব নিজস্ব ও কৃতঋণ তদ্ভব শব্দের মধ্যে কি বিস্তর পার্থক্য তা সহজেই অনুমেয়।

২। **আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ** ঃ এই প্রসঙ্গে বলা যায়, যে সব শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব উৎস থেকে বা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত হয়ে আসেনি, অন্যভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে, সেই শব্দগুলিকে আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ বলে। আবার এই শ্রেণির শব্দকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—ক) দেশি খ) বিদেশি।

(ক) **দেশি** ঃ যে সব শব্দ এদেশেরই অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে। সেগুলিকে দেশি শব্দ বলে। এই দেশি শব্দ আবার দুটি ভাগে বিভক্ত—i) অনার্য ii) আর্য।

[i] অনার্য শব্দ বলতে = অষ্ট্রিক—ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেঁকি, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গা, কুলা ইত্যাদি, দ্রাবিড়-পিল্লেই, কাল।

[ii] আর্য শব্দ হোল = হিন্দী লাগাতার, বাতাবরণ, সেলাম, দোস্ত, ওস্তাদ, মস্তান, ঘেরাও ইত্যাদি, গুজরাতি হরতাল ইত্যাদি

(খ) **বিদেশি** ঃ যে সব শব্দ এদেশের বাইরে কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে তাকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন—ইংরাজী = স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল, ফাইল, টিকিট, কোট, লাট, সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

জার্মান = জার, ন্যাতসী।
পোর্তুগীজ = আনারস, আলপিন, আলকাতরা, আলমারি, পেয়ারা, সাগু।
ফরাসি = কার্তুজ, কুপন, রেঁস্তোরাঁ, বুর্জোয়া, প্রোলেতারিয়েত।
ইতালি = কোম্পানী, গেজেট।
ওলন্দাজ = ইসকাবন, হরতন, রুইতন।
স্পেনীয় = কমরেড।
রুশীয় = সোভিয়েত, বলসেভিক।
চীনা = চা, চিনি।
বর্মী = ঘুগনী, লুঙ্গি।
ফরাসি = সরকার, দরবার, বিমা, আমীর, উজীর, ওমারহ বাদশা, খেতাব।
আরবি = আক্কেল, কেতাব, ফসল, মুহুরী, হজম, তামাসা, জিলা ইত্যাদি।

৩। **নবগঠিত ঃ** এই শ্রেণির শব্দগুলি মৌলিক কিংবা আগন্তুক শব্দের মত কোন নিয়ম না মেনেই একেবারেই বাংলায় চলে এসেছে। যে শব্দগুলি একার্থে জগাখিচুড়ী ধরণের যাদেরকে নির্দিষ্ট রূপে বাংলা বা, ইংরাজী, কিংবা সংস্কৃত অথবা অন্যকোন নির্দিষ্ট ভাষার সঙ্গে মেলানো যায় না, একেবারেই সংকরজাতীয়, তাকে নব গঠিত শব্দ রূপে আখ্যাত করা যায়। এই নব গঠিত শব্দ আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। যেমন—

(ক) **অবিমিশ্র শব্দ ঃ** নতুন ভাবে কিছু কিছু শব্দ গড়ে উঠেছে সেগুলির মধ্যে বিমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় না। যেমন—অনিকেত, অতিরেক ইত্যাদি।

(খ) **মিশ্র শব্দ ঃ** কিছু কিছু শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উপাদানে গড়ে উঠেছে, যা সংকর জাতীয় (Hybrid ward)। যেমন—ইং-হেড + বাং-পন্ডিত = হেডপন্ডিত/ইং-হেড + মৌলবি = (আরবি) = হেড মৌলবি/ফারসী-ফি + বাং-বছর = ফিবছর ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদ বা শব্দভান্ডার মূলতঃ সমৃদ্ধি লাভ করেছে দেশি বিদেশি নবগঠিত শব্দের দ্বারা, যা সাম্প্রতিক কালে খাঁটি বাংলা হিসাবে আমাদের মাঝে মাঝে ভুল হয়। তবে নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে এই জাতীয় শব্দ গঠনের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষার এত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতে পেরেছে।

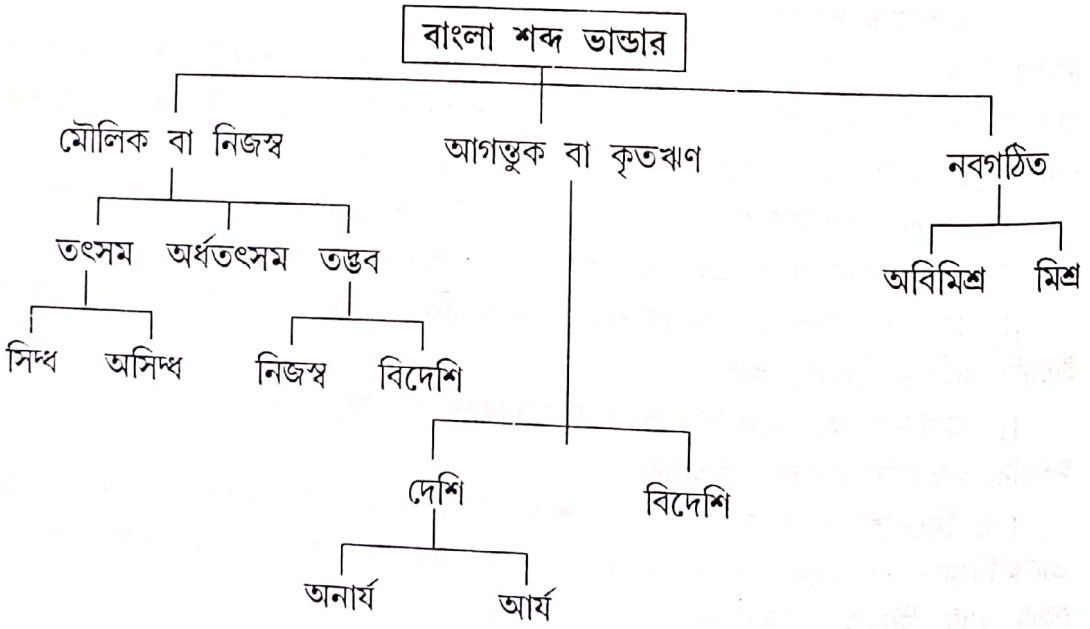

Scanned with CamScanner

SEM - II (General)

CC - 1B

ভাষাতত্ত্ব

আশিস কুমার চক্রবর্তী

Scanned with CamScanner